অধ্যায় - ০১

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

পরিবার পরিকল্পনা ম্যানুয়াল

অধ্যায় - ০১

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ছোট্ট ও জনবহুল দেশ। বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৭৯ লাখ (বিবিএস-২০১১)। অথচ ১৬৫০ সালে এই ভূখতে মাত্র ১ কোটি লোকের বসবাস ছিল। ২০০ বছর পর ১৮৫০ সালে এ সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২ কোটি। তারপর ৯১ বছর পর ১৯৪১ সালে জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪ কোটি ১৯ লাখ। কিন্তু এরপর মাত্র ৪০ বছরেই জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮ কোটি ৯৯ লাখ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে মাত্র ৪০ বছর পরে জনসংখ্যা আবারো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান হারে (১.৩৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আগামী ৫০ বছরের মধ্যেই দেশের জনসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণাগুবে। জনসংখ্যার এ অপরিমিত বৃদ্ধি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় বৃদ্ধি করবে। এজন্য সকলের চাহিদা মাফিক পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের সূচনা হয় ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে বেসরকারি পর্যায়ে। এর একযুগ পর থেকে সরকারিভাবে এদেশে এ কার্যক্রমের সূচনা হয়। কার্যক্রমের শুরুতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকলেও সময়ের প্রবাহে অধিকাংশই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। সকল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরষ্কার অর্জন করেছে। শিশুমৃত্যু হ্রাসের জন্য বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এমডিজি অ্যাওয়ার্ড ২০১০ পেয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে এ পুরষ্কার গ্রহণ করেছেন। কর্মসূচিতে এসব সাফল্য সত্ত্বেও কিছু জনমিতিক সূচকে আমাদের বর্তমান অগ্রগতি আরো ত্বরান্বিত করতে হবে। কারণ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য ও সেবাপ্রাপ্তি মানুষের মৌলিক অধিকারেরই অংশ।

পঞ্চাশ দশকের প্রথমার্ধে শুরু হওয়া বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বেশ কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করেছে। ১৯৫৩ সালে কয়েকজন সমাজকর্মী ও চিকিৎসক দ্বারা সূচিত এই কার্যক্রম এখন বিরাট ব্যাতি লাভ করেছে। ১৯৬৫ সাল থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের আবির্ভাব হয়। জনসংখ্যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে স্বীকৃত হবার পর এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশে অদ্যাবধি অর্জিত সাফল্য সারা বিশ্বে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল এই কর্মসূচিতে এখন বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়।

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির বর্তমান লক্ষ্য

• ২০২২ সালের মধ্যে মোট প্রজনন হার (TFR) ২.০ তে নামিয়ে আনা

• ২০২২ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার (CPR) ৭৫% এ উন্নীত করা

• ২০২২ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখে ১২১ এর নীচে নামিয়ে আনা

• ২০২২ সালের মধ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ২০% এ উন্নীত করা

• ২০২২ সালের মধ্যে পদ্ধতি ছেড়ে দেয়ার হার (Drop out) ২০% এ কমিয়ে আনা এঙে

• ২০২২ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার অপূরণীয় চাহিদা (Unmet need) ১০% এ নামিয়ে আনা

পরিবার পরিকল্পনা

ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোন দম্পতি স্বেচ্ছায় কখন এবং কতদিন পর সন্তান নেবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো পরিবার পরিকল্পনা।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি চালু আছে। সরকারি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে ৭টি আধুনিক পদ্ধতি চালু আছে। বেসরকারি অথবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এর বাইরেও কিছুসংখ্যক গ্রহীতা অন্যান্য গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন।

স্বল্পমেয়াদি পদ্ধতি

গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকার জন্য এ সকল পদ্ধতি বারবার ব্যবহার করতে হয়। যেমন-

• কনডম-প্রতিবার সহবাসের সময় সঠিকভাবে নিয়মিত ব্যবহার করতে হয়।

• খাবার বড়ি-প্রতিদিন একটি করে খেতে হয়।

• ইনজেকশন (ডিপো-প্রভেরা)-তিন মাস অন্তর গ্রহণ করতে হয়।

দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি

যে সকল পদ্ধতি একবার গ্রহণ করে এক বা একাধিক বছর গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকা যায় সে সকল পদ্ধতিই দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি।

• আইইউডি- কপার টি ৩৮০এ (Copper T 380A), ১০ বছর মেয়াদি

• ইমপ্ল্যান্ট ৩ অথবা ৫ বছর মেয়াদি

স্থায়ী পদ্ধতি

সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী সক্ষম দম্পতির অপারেশন এর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সন্ধান জন্মদানের ক্ষমতা বোধ করা হয়।

• মহিলাদের স্থায়ী পদ্ধতি (টিউবেকটমি)

• পুরুষদের স্থায়ী পদ্ধতি (এনএসভি)

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির কয়েকটি পর্যায়

পর্যায়-১: ১৯৫৩-৫৯ স্বেচ্ছাসেবী পর্যায়

১৯৫৩ সালে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফপিএবি) কর্তৃক সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগে সীমিত আকারে শুধুমাত্র নগর এলাকায় হাসপাতাল এবং ক্লিনিকের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু করা হয়।

পর্যায়-২: ১৯৬০-৬৪ সরকারি উদ্যোগে ক্লিনিকভিত্তিক কার্যক্রম

১৯৬০ সালে স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে ক্লিনিকভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে এবং গ্রাম্য ডিসপেনসারিতে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলা হয়।

পর্যায়-৩: ১৯৬৫-৭০ মাঠ পর্যায়ে সরকারি পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

এ পর্যায়ে কর্মসূচিকে পরিবার পরিকল্পনা বোর্ডের আর্থতায় এনে মাঠ পর্যায়ে সক্ষম দম্পতিদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাঠ কর্মীসহ খণ্ডকালীন মিডওয়াইফ নিয়োগ করা হয়। ক্লিনিক্যাল এবং নন-ক্লিনিক্যাল বিরতিকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম গ্রহীতার দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পর্যায়-৪: ১৯৭২-৭৪ সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি

এ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে একীভূত করা হয়। এই সময় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে খাবার বড়ি বিতরণ শুরু হয়।

পর্যায়-৫: ১৯৭৫-৮০ মা ও শিশু স্বাস্থ্যভিত্তিক বহুমুখী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

১৯৭৫ সালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কাজ শুরু করে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ নামে নতুন বিভাগের সৃষ্টি করা হয়। এই সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে সভাপতি করে জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ গঠন করা হয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীকে সভাপতি করে সংশ্লিষ্ট সচিবদের নিয়ে কর্মসূচি পরিকল্পনা ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কো-অর্ডিনেশন কমিটিও গঠন করা হয়।

১৯৭৬ সালের জুন মাসে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। এই সময় মাঠ পর্যায়ে পূর্ণকালীন মহিলা ও পুরুষ মাঠকর্মী নিয়োগ করা হয় এবং মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মিনিল্যাপ টিউবেকটমি ও ভ্যাসেকটমির প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় এবং বিশেষ ক্যাম্পের মাধ্যমে সেবা প্রদান শুরু করা হয়।

পর্যায়-৬: ১৯৮০-৮৫ মাঠ পর্যায়ে একীভূত কার্যক্রম

ও নিম্ন পর্যায়ে মা। শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের সাথে একীভূত করা হয়। জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ (National Population Council)-কে পুনর্গঠন করে জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ (National Council for Population Control) - এ রূপান্তরিত করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি নির্বাহী কমিটিও গঠন করা হয়। এই সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে "উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটি" গঠন করা হয়।

১৯৮০ সালে মিনিল্যাপ টিউবেকটমি অপারেশন অধিকতর নিরাপদ উপায়ে করার জন্য 'নতুন এবং নিরাপদ অ্যানেস্থেসিয়া রেজিমেন' শুরু করা হয়। এ সময়েই সারাদেশে সর্বোচ্চ সংখ্যক স্থায়ী পদ্ধতি প্রদান করা হয় এবং আইইউডি গ্রহীতার হারও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে।

পর্যায়-৭: ১৯৮৫-৯০ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

মা, শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় এবং পরিবার পরিকল্পনা রেজিস্টার এর প্রবর্তন করা হয়। একই সময়ে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রাম ও দূরবর্তী এলাকায় মা, শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান শুরু করা হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও জেলা সমন্বয়কারীর নেতৃত্বে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম একটি "সামাজিক আন্দোলনে" রূপান্তরিত হয়।

এই সময় জনন্মবিরতিকরণ ইনজেকশন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করা হয় এবং বাংলাদেশে ইমপ্ল্যান্ট (নরপ্ল্যান্ট) এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সম্পন্ন হয়। এই সময়েই তুরিবিহীন ভ্যাসেকটমি (এনএসভি) এর উপর চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পর্যায়-৮: ১৯৯০-৯৫ নিবিড় সেবাদান পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

এ পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সেবা প্রদান কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করা হয় এবং এক্ষেত্রে সরকারি অর্থায়ন বৃদ্ধি করা হয়। বেসরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ সরকারি কার্যক্রমের সম্পূরক শক্তি হিসাবে তাদের কার্যক্রমকে জোরদার করে। এই সময় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে নিজস্ব চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়।

পর্যায়-৯ : ১৯৯৫-১৯৯৮ পঞ্চম স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের প্রস্তুতিকাল

এই সময় সেক্টর ভিত্তিক কার্যক্রমের প্রস্তুতি নেয়া হয়। এ সময়ে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

পর্যায়-১০: ১৯৯৮-২০০৩ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HPSP)

মাঠ পর্যায়ের সেবা প্রদান কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতি ৬,০০০ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় এবং সর্বমোট ১৮,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মোট প্রজনন হার স্থির থাকে। এ পর্যায়েই পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগকে পুনরায় বিভক্ত করে ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পর্যায়-১১: ২০০৩-২০১১ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রম (HNPSP)

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি এবং জাতিসংঘের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (MDG) সামনে রেখে ২০০৩ ইং সালে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি যাত্রা শুরু করে। এ কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম আলাদা আলাদাভাবে বাস্তবায়নের কাজ পুনরায় শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে পাঁচ বছর পর পুনরায় পরিবার কল্যাণ সহকারীদের রেজিস্টার এবং বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন কাজ শুরু করা হয়। পাঁচ বছর পর পরিবার

পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের অগ্রগতির তথ্য প্রদান শুরু হয়। এ সময়ে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়, ছুরিবিহীন ভ্যাসেকটমির জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে সারা দেশেই বৃদ্ধি পায় এবং মোট প্রজনন হার ২০১১ সালে ২.৩ এ নেমে আসে।

পর্যায়-১২: ২০১১-২০১৬ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রম (HPNSDP)

২০১৫ সালের মধ্যে MDG১, ৪, ৫ ও ৬ অর্জনের লক্ষ্যে সেবার বিস্তৃতির জন্য এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাপ্রাপ্তি এবং ব্যবহার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বিবেচনায় নিয়ে মাল্টিসেকারাল কার্যক্রম এর মাধ্যমে সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অপূরণীয় চাহিদা, দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং গ্রামীণ ও শহর এলাকাকে এ কার্যক্রমে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

পর্যায়-১৩: জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২২ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রম (HPNSP)

২০৩০ সালের মধ্যে SDG বিশেষ করে SDG-3 অর্জন করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা সেবার বিস্তৃতির লক্ষ্যে সরকারি, এনজিও এবং বে-সরকারি সেক্টরের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। একই সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন কার্যক্রমের সাথে

সমন্বয়ের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রম-এ নেতৃত্ব (Leadership) ও পরিচালন প্রক্রিয়া (Governance) এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (Health Systems) জোরদারকরণ ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, অপূরণীয় চাহিদা, দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং দুর্গম, অনগ্রসর, গ্রামীণ ও শহর এলাকাকে এ কার্যক্রমে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

কতিপয় সংজ্ঞা

জন্মবিরতিকরণ সামগ্রী (Contraceptives)

• যে সকল সামগ্রীর মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা যায়।

পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning)

• ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোনো দম্পত্তি স্বেচ্ছায় কখন, এবং কতদিন পর পর সন্তান নেবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াই হলো পরিবার পরিকল্পনা।

মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate-TFR)

• একজন মহিলা সারা জীবনে গড়ে যত সংখ্যক জীবিত সন্তান জন্মদান করবেন তা-ই মোট প্রজনন হার বা মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা।

পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (Contraceptive Prevalence Rate-CPR)

• কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন এলাকার মোট সক্ষম দম্পতির মধ্যে শতকরা যত সংখ্যক দম্পতি কোন না কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে তা ঐ সময়ে ঐ এলাকার সিপিআর বা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার।

পদ্ধতি গ্রহণকারী হার (Contraceptive Acceptance Rate-CAR)

• কোন এলাকার মোট সক্ষম দম্পতির মধ্যে শতকরা যত সংখ্যক সক্ষম দম্পতি কোন না কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা ঐ এলাকার সিএআর বা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার।

অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need)

• যে সকল দম্পতি দেরিতে সন্তান নিতে চায় অথবা আর সন্তান নিতে চায় না কিন্তু কোন আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করে না তাকে অপূর্ণ চাহিদা বলে।

পদ্ধতি ছেড়ে দেয়া বা ড্রপ-আউট (Discontinuation/Drop out)

• কোন সক্ষম দম্পতি একটি পদ্ধতি গ্রহণ করে যদি এক বছর পূর্ণ হবার আগেই ঐ পদ্ধতিটি ব্যবহার বন্ধ করে দেয়, সেক্ষেত্রে ঐ দম্পতি পদ্ধতিটি ছেড়ে দিয়েছেন বলে গণ্য করা হয়। এক নাগাড়ে একটি পদ্ধতি ১২ মাস ব্যবহার না করলে ঐ পদ্ধতির Drop out / Discontinuation ধরা হয়।

নিট প্রজনন হার ১ (Net Reproduction Rate 1- NRR 1)

• গড়ে প্রত্যেক মহিলা যদি সারা জীবনে সন্তান জন্মদানে সক্ষম একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন তাহলে সে অবস্থাকে নিট প্রজনন হার ১ (NRR 1) বলা হয়। এ অবস্থাকে Replacement Level of Fertility ও বলা হয়।

মাতৃমৃত্যুর হার (Maternal Mortality Rate-MMR)

• কোন দেশে বা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় প্রতি বছরে প্রতি লাখ জীবিত শিশু জন্মদান করতে গিয়ে গর্ভাবস্থায় অথবা প্রসবকালীন সময়ে অথবা প্রসবের পর ৪২ দিনের মধ্যে যে কজন মা গর্ভজনিত জটিলতায় মারা যান সেই সংখ্যাকে মাতৃমুত্যুর হার বলা হয়।

শিশুমৃত্যুর হার (Infant Mortality Rate-IMR)

• কোন দেশে বা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় প্রতি বছর প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে অনুর্দ্ধ এক বছর বয়সের যে কজন শিশু মৃত্যুবরণ করে সেই সংখ্যাকে শিশুমৃত্যুর হার বলা হয়।

ড্রপ-আউট (Drop out / Discontinuation)-এর কারণসমূহ

• পদ্ধতি দেয়ার পূর্বে পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা সঠিকভাবে গ্রহীতাকে অবহিত না করা

• সঠিকভাবে গ্রহীতা বাছাই না করা

• গ্রহীতাকে সঠিক পদ্ধতি না দেয়া

• পদ্ধতি দেয়ার পর সঠিক নিয়মে গ্রহীতাকে ফলোআপ না করা

• পদ্ধতি দেয়ার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে না করা

ড্রপ আউট কমানোর উপায়

• সঠিকভাবে চেকলিস্ট অনুসরণ করে গ্রহীতা বাছাইকরণ ও সঠিক পদ্ধতি দেয়ার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

• পদ্ধতি দেয়ার পূর্বে পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা অর্থাৎ সঠিকভাবে গ্রহীতাকে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করা

• পদ্ধতি দেয়ার পর সঠিক নিয়মে গ্রহীতাকে ফলোআপ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

• সক্ষম দম্পতিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রয়োজনীয় জন্মবিরতিকরণ সামগ্রীর সরবরাহ করা

• পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। প্রতিমাসে মাসিক সভায় পরিবার পরিকল্পনা ম্যানুয়াল অনুযায়ী সকল পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে তা বাস্তবায়ন করা।

• অপূর্ণ চাহিদার কারণসমূহ

• পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় (Concerns about side effects) পদ্ধতি ব্যবহার করতে ভয় পায়

• অজ্ঞতার কারণে নবদম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে অনীহা

• প্রসব পরবর্তী মাসিক বন্ধ থাকার জন্য বা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য (Postpartum amenorrhea or breast feeding) গ্রহীতা মনে করে যে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা নাই

• জন্মবিরতিকরণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা (Stock out) বা দূরবর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থা (Lack of access/too far)

• ধর্মীয় কুসংস্কার, Cultural value এর জন্য দম্পতি পদ্ধতি ব্যবহার করে না।

• অন্যান্য অবস্থা যেমন সেবাপ্রদানকারীর অপ্রতুলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্গম এলাকা, ভাসমান জনগোষ্ঠী ইত্যাদি

অপূর্ণ চাহিদার হার কমানোর উপায়

• পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। প্রতি মাসে মাসিক সভায় পরিবার পরিকল্পনা ম্যানুয়াল অনুযায়ী সকল পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে তা বাস্তবায়ন করা

• নব দম্পতিদের আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত এবং স্বেচ্ছায় পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করা

• সকল সক্ষম দম্পতিকে (১৫-৪৯ বছর) আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা

• প্রসবের পরপরই আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা

দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পদ্ধতির গুরুত্ব

• আমাদের দেশে স্বল্পমেয়াদি পদ্ধতি ব্যবহারকারীগণ ইচ্ছামতো পদ্ধতি ব্যবহার বন্ধ করে দেন এবং পরিবর্তন করেন। ফলে তারা অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে গর্ভধারণ করেন। দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পদ্ধতি একবার গ্রহণ করলে গ্রহীতা অনেকদিন পর্যন্ত বা সারা জীবন অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের ঝুঁকিমুক্ত থাকে। তাকে প্রতিনিয়ত সেবা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। এসব পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সাফল্যের হার অনেক বেশি এবং ব্যয় সাশ্রয়ী। এ সকল পদ্ধতি ব্যবহার শারীরিক ও যৌন শক্তির কোন তারতম্য হয় না।

• তাই দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বাড়ানো সম্ভব হলে সার্থকভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে। ফলে গড় সন্তান সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং আমাদের দেশ একটি স্থিতিশীল জনগোষ্ঠী অর্জনে সক্ষম হবে।